আজকের কাগজ
তারিখ ... 10 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭

সরকারি কলেজে শিক্ষকদের পদোন্নতি ও পদ সৃষ্টি

নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস

চাকরি জীবনে প্রমোশন বা পদোন্নতি একটি বড় প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তির আশায় চাকরিজীবী ব্যক্তিরা অধীর আগ্রহ ও আশা নিয়ে কাজ করে যান কর্মক্ষেত্রে। পদোন্নতি হচ্ছে চাকরি জীবনের সার্থক শ্রমদানের একটি পুরস্কার। প্রতিযোগিতায় যারা ভাল করেন তারাই তো পুরস্কার পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। কিন্তু সরকারি কলেজে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বর্তমানে এ নিয়মটি কার্যকরী নয়। এখানে শুধু চাকরিকালের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি দেয়া হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা বা মেধার কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। চাকরিকালের জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিতেও যে পদোন্নতি দেয়া হয় সেখানেও রয়েছে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি। বর্তমান পদোন্নতির নিয়মানুসারে কোনও শিক্ষকের চাকরিকাল সাত বছর পূর্ণ হলে প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক বার বছর পূর্ণ হলে সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক এবং পনের বছর পূর্ণ হলে সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক বা অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। এই নিয়ম ধরে চাকরিকালের জ্যেষ্ঠতা অনুসারে পদোন্নতি তালিকা তৈরি করা হয় তারপর যেসব বিষয়ে পদ শূন্য আছে সেসব বিষয়ের শিক্ষকদের পদোন্নতি দেয়া হয়। আর যেসব বিষয়ে পদ শূন্য নেই সেসব বিষয়ের শিক্ষকরা পদোন্নতি থেকে হন বঞ্চিত। এতে করে বিষয়ের কারণে কেহ ১৫-২০ বছরের মধ্যে অধ্যাপক বা অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হচ্ছেন। আবার কেউ উক্ত সময় উত্তীর্ণ হবার পরও প্রভাষকই থেকে যাচ্ছেন, চাকরি জীবনে এটা যে কত বড় বেদনাদায়ক তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। কি অর্থ, কি সম্মান সব দিক থেকেই তাঁরা হন বঞ্চিত। একই সঙ্গে চাকরিতে যোগদান করে কেউ যদি ১৫-২০ বছরের মধ্যে অধ্যাপক বা অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন আবার কেউ যদি উক্ত সময়ের মধ্যে প্রভাষকই থেকে যান তবে শেষোক্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা কি হতে পারে তা ভেবে দেখা দরকার। বিষয়ের কারণে জুনিয়র শিক্ষকরা সিনিয়র শিক্ষকদের অতিক্রম করে সহকারী বা সহযোগী অধ্যাপক অথবা অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হচ্ছেন অথচ সিনিয়র শিক্ষক হয়তো প্রভাষকরূপেই থেকে যাচ্ছেন। একই ক্যাডার সার্ভিসে এরূপ বৈষম্য কি করে থাকতে পারে তা বোধগম্য নয়।

পদোন্নতির ভিত্তি যদি শিক্ষাগত যোগ্যতা বা মেধা হত তাহলে উক্তরূপ বৈষম্য হলেও মনোকষ্টের কোন কারণ ছিল না। কারণ যোগ্যতার ভিত্তিতে কেউ যদি উপরে উঠে যায় তাতে বলার কিছু থাকে না। বর্তমান পৃথিবীতে মেধা এবং যোগ্যতার আসন সর্বোচ্চ। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মেধার অধিকতর মূল্য দেয়া আবশ্যক তাই যদি না হয়, তাহলে মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এ পেশায় আসবে কেন? "শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড", "শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর" এ ধরণের কথা আমরা প্রায় সকলের মুখেই শুনতে পাই। ভাল কারিগর না হলে তার কাছ থেকে যেমন ভাল কিছু তৈরির আশা করা যায় না, তেমনি যোগ্যতাসম্পন্ন ভাল শিক্ষক না হলে উপরি উক্ত বাস্তব কথাগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এ পেশায় আসতে চান না। কারণ পূর্বে শিক্ষকদের যে মান ও মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা এখন বিলুপ্ত। রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এখন আর গুরু-শিষ্য নয়। অন্যান্য পেশার তুলনায় এ পেশার আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাও কম। তাই দেখা যায়, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ... [illegible]রার পর মেধাসম্পন্ন ছেলে-মেয়েরা সাধারণত যায় ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। তারপর সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে প্রশাসন, বৈদেশিক বা অন্য কোন চাকরিকে অধিকতর পছন্দ দিয়ে থাকেন। শিক্ষকতা পেশায় যদি অধিকতর আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা এবং মর্যাদাসম্পন্ন বেতন স্কেল থাকে তবে মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও এ পেশায় আসতে আগ্রহী হবেন। তাতে আমাদের শিক্ষার মানও হবে উন্নত। পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে হলে কলেজ শিক্ষায়ও এ নিয়মটি কার্যকরী করা দরকার। আপ-গ্রেড পদ্ধতির মাধ্যমে পদোন্নতি দেয়া হলে ১৯৮৩ সালের এনাম কমিটির বিভাজনকৃত পদের প্রয়োজন হয় না। প্রতি বিষয়ে কেবলমাত্র চারটি করে প্রভাষকের পদ থাকলে আপ-গ্রেড পদ্ধতির মাধ্যমে উক্ত প্রভাষকের পদ নিয়েই ক্রমান্বয়ে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যাপক বা অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হবেন।

এনাম কমিটি '৮৩ ডিগ্রী পর্যায় সরকারী কলেজে সংস্কৃত এবং ইসলামী শিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ে চারটি করে শিক্ষক পদ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বাংলা এবং ইংরেজী বিষয়ের ছাত্র সংখ্যা অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অনেক বেশি। সে কারণে বাংলা এবং ইংরেজী বিষয়ে শিক্ষক পদের সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, যে সব কলেজে সংস্কৃত এবং ইসলামী শিক্ষা পাঠ্য বিষয় হিসেবে চালু আছে সে সব কলেজে প্রচুর সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এ দু'টি বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করছে। কোন কোন কলেজে এ দু'টি বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বিষয়ের তুলনায় বহু গুণ বেশি। সরকারি নাজিমউদ্দিন কলেজ, মাদারীপুরে সংস্কৃত ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে চারটি শ্রেণীতে (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষ) প্রতি বছর প্রায় যথাক্রমে ৪৫০ ও ১৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে। সরকারি বঙ্গবন্ধু মহাবিদ্যালয়; গোপালগঞ্জ-এ সংস্কৃত বিষয়ে এ সংখ্যা প্রায় ১২০০ জন। এরূপ উদাহরণ অনেক দেয়া যেতে পারে। অথচ কোন কোন বিষয়ে উক্ত চারটি শ্রেণীতে ৫০ জনও ছাত্র-ছাত্রী হবে না। তাই পদোন্নতির পদ্ধতি, বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র সংখ্যার আনুপাতিক হার ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কলেজে নতুন করে পদ সৃষ্টি আবশ্যক।

পদোন্নতির যোগ্যতা কেবলমাত্র চাকরিকালের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তি হওয়া উচিত নয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা, ডিগ্রী ইত্যাদিও পদোন্নতি প্রাপ্তির মাপকাঠি হওয়া উচিত। একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করতে একজন শিক্ষককে প্রচুর পড়াশুনা করতে হয়। তাতে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা বাড়ে অনেক। বর্তমানে পদোন্নতির ক্ষেত্রে এর কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না বলে আমরা অধিকাংশ শিক্ষকরা ক্লাসের দায়সারা গোছের পড়াশুনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি। কোন গবেষণামূলক কষ্টকর লেখাপড়ার মধ্যে যেতে চাই না। কিন্তু পদোন্নতির ক্ষেত্রে যদি এর গুরুত্ব দেয়া হয়, তাহলে শিক্ষকরা আগ্রহী হবেন উক্তরূপ পড়াশুনার গভীরে প্রবেশ করতে। তাতে শিক্ষক এবং শিক্ষার মানও হবে উন্নত। সৃষ্টিশীল গবেষণা কর্মের দ্বারা দেশ ও জাতিও হবে উপকৃত।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমেও পদোন্নতির ব্যবস্থা হতে পারে। তবে সে পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় হতে হবে বিষয়ভিত্তিক। চাকরিবিধি এবং সাধারণ জ্ঞানের পাঠ্য বিষয় থাকবে খুবই সীমিত। কারণ শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের বেশির ভাগ প্রয়োজন হয় পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞান। বর্তমানে শিক্ষকদের সিনিয়র স্কেল প্রাপ্তি পরীক্ষার যে পাঠ্যসূচি চালু আছে তা শুধু একজন দক্ষ প্রশাসক তৈরির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু খুব কম সংখ্যক শিক্ষকই অধ্যক্ষ হন বা প্রশাসনে যান। তবে অধ্যক্ষ পদে পদোন্নতির জন্য তাঁকে অবশ্যই চাকরিবিধি ও সাধারণ জ্ঞানসম্বলিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। তাতে অধ্যক্ষ পদের গুণগত মান বাড়বে।

ডঃ নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস ঃ প্রভাষক, সংস্কৃত বিভাগ, সরকারি নাজিমউদ্দিন কলেজ, মাদারীপুর।